ভগবান ব্রজানন্দ সম্পর্কে কিছু কথা

ব্রজেন দাস, দক্ষিণ গাঁও, ঢাকা-১২১৪।

ভগবান ব্রজানন্দ সম্পর্কে বলার মত কোন যোগ্যতা আমার নেই।আমার না আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, না আছে জ্ঞানের গভীরতা, না পেয়েছি ঠাকুরের সান্নিধ্য।আমার মত একজন অধমের পক্ষে ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা একেবারেই বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেয়ার সামিল।তবু ঠাকুরের কৃপাকে সম্বল করে যতটুকু জানা আছে তা গুরু ভাই-বোনদের মাঝে বর্ণিত করার মানসে আমার এ চেষ্টা।আমার এ লেখার মাঝে যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মার্জনা করে নিবেন।

<u>কিভাবে বুড়াশিব ধামে আগমন:</u>

আমার মা জন্ম নেয়ার আগে আমার দিদিমার বেশ কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহন করে শিশু অবস্থায়ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েও দিদিমার সন্তান বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হতে পারেনি।এমন অবস্থায় অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন আমার দাদু এবং দিদিমা। ঐ সময়টা ছিল বৃটিশ শাসন। আমার দাদু ও দিদিমা এলাকার এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার নিকট জানতে পারেন - ঢাকার রমনায় এক বাক্যসিদ্ধা সন্যা+সী আছেন যিনি বাক্য দিলে মানুষের কাংখিত ফল পান।অর্থাৎ যে যেই প্রার্থনা নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হন এবং তিনি যদি একবার বাক্য দেন তাহলে প্রার্থনাকারীর আশা-আকাংখা পূরণ হয়ে যায়।এই সংবাদটি জানতে পেরে আমার দিদিমা ঐ ভদ্রমহিলাকে নিয়ে একদিন শ্রী শ্রী বুড়াশিব ধামে গমন করেন।ঐ ভদ্রমহিলা প্রায়ই যেতেন ধামে, সেই হিসাবে ধামের অনেকেই ভদ্রমহিলাকে চিনতেন।ধামে গমন করে ভদ্রমহিলা গুরুদেবকে প্রনাম করলেন এবং দিদিমাকে প্রনাম করতে বললেন।দিদিমা বাবাকে প্রনাম করে তার সন্তান বেঁচে না থাকার কাহিনী কান্নাজরিত কণ্ঠে বলেন বাবার নিকট।বাবা এক দৃষ্টিতে দিদিমার দিকে তাকিয়ে দিদিমার সব কথা শুনলেন।দিদিমার কথা শুনে বাবা শুধু বলেন - মা, আসা-যাওয়া করো, আসা-যাওয়া করো।এই একটি বাক্যই দু'বার বলেন।

এর পর হতে শুরু হলো দাদু ও দিদিমার শ্রী শ্রী বুড়াশিব ধামে আসা-যাওয়া।আসা-যাওয়া করতে করতে প্রায় ০৫ (পাঁচ) বছর পর একদিন গুরুদেব বাক্য দিলেন, বলেন - যা তোর সন্তান হবে এবং বাঁচবে।এর বছর খানেক পর আমার মায়ের জন্ম হলো।মায়ের জন্মের কয়েকদিন পর পাতলা পায়খানা শুরু হয় এবং এমন পর্যায়ে চলে যায় যে বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীন হয়ে যায়।মেয়ের এই অবস্থা দেখে দাদু অর্ধপাগল অবস্থায় ভর দুপুরে ছোটে বুড়াশিব ধামে গুরুদেবকে জানানোর জন্য।তখন আমাদের বাড়ি হতে ধামে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করতে হতো।পথে একটি খাল ছিল, সেই খালে তখন জল ছিলনা, শুকিয়ে গিয়েছিল, মানুষ হেঁটে খাল পার হতো।ভর দুপুর মাঠে কোন লোকজন নেই (দাদুর মুখ থেকে শোনা) দাদু যখন হেঁটে হেঁটে খাল পার হচ্ছে, খালের মাঝখানে গিয়ে দেখে ওপার থেকে গুরুদেব খালের দিকে নামছে এবং দাদুর সামনে এসে দাদুকে জিজ্ঞেস করেন - তুই কোথায় যাচ্ছিস ? দাদু বলে - বাবা, আমিতো আপনার ওখানেই যাচ্ছি, আমার মেয়ে মরণাপন্ন, এতক্ষন বেঁচে আছে কি-না জানিনা - এ কথা বলে দাদু বাবার চরণে লুটিয়ে পড়ে এবং পা ধরে রাখে।বাবা তখন বলেন - ছাড় ছাড় আমিতো তোর ওখানেই যাচ্ছিলাম।তুই কি চাস্ ? দাদু তখন বলে - আমিতো মেয়ে চাই।বাবা আবার বলেন - মেয়ে চাস্ ? তখনও দাদু বলে - হ্যাঁ মেয়ে চাই।বাবা পুনরায় বলেন - পা ছাড়, বাড়ি যা, বাড়ি গিয়ে দেখ তোর মেয়ে ভাল হয়ে গেছে।এই কথা শুনে দাদু গুরুদেবের পা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয় এবং খালের মাঝ থেকে উপরে উঠে পিছনের দিকে তাকায়।তাকিয়ে দেখে বাবা নেই, এমনকি আসে-পাশে কোন লোকজন নেই।তখন আমার দাদুর মনে একটা বড় ধরণের ধাক্কা লাগলো এবং মনে মনে ভাবলো - আমি কি দেখলাম এটা, আমি কতবড় ভুল করেছি, কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারলাম না।তিনিতো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন - 'আমি কি চাই'।আমিতো মেয়ে চেয়েছি, আরতো কিছু চাইলাম না, কি ভুল আমি করলাম।এই কথা ভাবতে ভাবতে দাদু বাড়ি আসলেন এবং বাড়ি এসে দেখেন মেয়ে অনেকটা ভাল।আস্তে আস্তে কয়েক দিনের মধ্যে মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।এই ঘটনার পর থেকে মেয়ের শারীরিক কোন অসুবিধা দেখা দিলে দাদু দৌড়ে যেতেন গুরুদেবের নিকট।গুরুদেব অমুক গাছের পাতার রস, অমুক গাছের শিকরের রস খাইয়ে দেয়ার কথা বলতেন এবং ঐগুলো খাইয়ে দিলেই অসুখ ভাল হয়ে যেত।এভাবে আমার দাদু-দিদিমার সংসার সামনের দিকে এগুতে লাগলো।আমার মায়ের জন্মের পর আমার এক মামা ও এক মাশির জন্ম হয়।দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে আমার দাদুর সংসার চলতে থাকে গুরুকে সাথী করে।

এভাবে চলতে চলতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর আমার মায়ের বিয়ে হয় গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে।পঞ্চাশ এর দশকে আমার জন্ম হয় গুরুদেবের আশীর্বাদে।মায়ের নিকট জানতে পারি - আমার নামটি রেখেছেন বাবা ব্রজানন্দ নিজে এবং আমার মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেন ঠাকুর নিজ হাতে।আরও জানতে পারি - আমার ছোট বেলায় কোন অসুখ হলে আমার মায়ের মত আমাকেও বিভিন্ন গাছের লতা-পাতার রস ঔষধ হিসাবে খাওয়াতে বলতেন ঠাকুর ব্রজানন্দ এবং সেই ঔষধেই অসুখ ভাল হয়ে যেত।যখন আমি ছোট তখন মা ও দিদিমার সাথে ধামে যেতাম পায়ে হেঁটে।সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝ দিয়ে একটা ছোট পায়ে-হাঁটা রাস্তা ছিল।এখনও মনে পরে মাঝে মধ্যে সেই দিনের কথা। গুরুদেব আসন ঘরে আসনে বসে থাকতেন, আর ভক্তবৃন্দরা তাদের অভাব অভিযোগ, রোগ-শোক ইত্যাদি নানা বিষয়ে ঠাকুরের নিকট আবেদন করতেন, ঠাকুর ব্রজানন্দ শুনতেন তাদের আবেদন এবং মাঝে-মধ্যে কাউকে বাক্য দিতেন, কাউকে শান্তনা দিতেন।আমি তখন কিছুই বুঝতাম না, শুধু তাকিয়ে দেখতাম।পাকিস্তানের শেষ দিকে একদিন ধামে গেলাম, গুরুদেবকে প্রনাম করার পর সন্যাসী মুকুন্দানন্দ আমাকে এবং আমার জেঠাতো ভাই (গোপাল) কে বলেন - চলো বাগানের ফুল গাছগুলোতে জল দিতে হবে।গোপাল দা কুয়ো থেকে জল তুলে দেয় আর আমি সাধু মুকুন্দানন্দ এর নিকট নিয়ে দেই, সাধু মুকুন্দানন্দ ফুল গাছের গোড়ায় ঢেলে দেয়।সাড়া বাগানে জল দেয়া হলো।এই জল দেয়ায় যতটুকু পরিশ্রান্ত হওয়ার

কথা ছিল তা তিন জনের একজনও হলাম না।ধামের যে একটা মাহাত্ব তা উপলব্দি করলাম।প্রসাদ নেয়ার সময় সাধু মুকুন্দানন্দ আমাকে এক চামচ দৈ বেশী দিলেন এবং বলেন - তুই আজ অনেক পরিশ্রম করেছিস তাই তোকে এক চামচ দৈ বেশী দিলাম, আমি বললাম কৈ পরিশ্রমতো লাগেনি।আজও মাঝে-মধ্যে সে কথাটি মনে পরে।

গুরুদেবের কথা অমান্য করায়:

ষাট এর দশকে একবার গুরুদেব আমার পিতাকে বলেন - সামনের বাংলা বছরটা তোমার জন্য শুভ দেখছি না, কাজেই বছরের প্রথম দিনটা ধামে রাত্রি যাপন করে যেও। আমার পিতা গুরুদেবের কথা না শুনে আমার পিশির বাড়ি অর্থাৎ তার বোনের বাড়ি বেড়াতে যায়।ঠিক ঐ বছর আমাদের পাড়ায় বসন্ত রোগ দেখা দেয়, আমাদের বাড়িতে আমরা দুই ভাই ছাড়া সকলেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়।আমার পিতাও আক্রান্ত হন এবং মারাত্মক আকার ধারণ করে, বাঁচার কোন লক্ষন ছিলনা, চেহারা চেনা যেত না, ঐ সময় আমার ছোট দুই বোন এবং এক ভাতিজা আমাদের বাড়ি হতে মৃত্যুবরণ করে, আমাদের পাড়ার বেশ কয়েকজন লোক ঐ সময় মারা যায়।আমার পিতার অবস্থা খুবই খারাপ।একদিন দুপুর বেলা আমার পিতা বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখেন - গুরুদেব ঘরের দরজায় দাড়ানো, হাতে একটি লাঠি এবং কাকে যেন বলছেন - ওর উপর এত বড় বোঝা দিয়েছ, ওতো সহ্য করতে পারছে না, তাড়াতাড়ি বোঝা নামাও ওর উপর হতে।এ কথা শোনার পর পর তাকিয়ে দেখেন দরজায় কেউ নেই, একেবারে ফাঁকা।ঠিক ঐ দিন থেকেই আমার পিতার শরীরের ব্যাথা-বেদনা কমতে শুরু করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন। বাবা সুস্থ হওয়ার পর মা, দিদিমাসহ ধামে যান এবং গুরুদেবকে বিপদের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন।গুরুদেব আমার পিতার কথা শুনে বলেন - গাছ রাখলে ফল রাখা যায় না, ফল রাখলে গাছ রাখা যায় না, এ অবস্থায় দেখলাম গাছ থাকলে ফল একদিন হবে, তাই গাছকে রক্ষা করলাম।

সময় কথা বলে:

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরের একটি ঘটনা - একদিন বেলা আনুমানিক এগারটা সাড়ে এগারটা হবে আমি ধামে গিয়েছি।গুরুদেবকে প্রনাম করে আসন ঘরের এক কোনে চুপ করে বসে বাবার দিকে তাকিয়ে আছি, আসন ঘরে আরও ২/৩ জন লোক বসা ছিল।অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ভদ্রমহিলা আসলেন এক প্যাকেট মিস্টি নিয়ে, এসে ভদ্রমহিলা মিস্টির প্যাকেটটি রেখে গুরুদেবকে প্রনাম করলেন, প্রনাম করে এক পাশে বসে গুরুদেবকে বলেন - বাবা, ভাড়াটিয়ারা ঘর ভাড়া দিচ্ছেনা, বাড়িও ছাড়ছেনা, এখন আমি কি করব ? গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বলেন - মিনিস্টার পত্নী এক সময় তার দাপটে সবাই কম্পিত ছিল, আর আজ সামান্য ভাড়াটিয়া ভাড়া দেয়না, ঘরও ছাড়েনা, দেখ সময়ে কি হয়।এতটুকুই বলেন।পরে জানতে পারলাম ভদ্র মহিলাটি পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর ড. মালেক এর পত্নী।আমি গুরুদেবকে যতদিন দেখেছি শুধু তাকিয়ে থাকতাম তাঁর দিকে, কোনদিন কোন জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।তাছাড়া জিজ্ঞেস করার মত কোন জ্ঞানও ছিলনা।কাকে কি বলেন সেটা শোনার চেষ্টা করতাম।কোনদিন দেখিনি কাউকে ২/৪ কথার বেশী কথা বলতে, তবে তিনি শুনতেন সকলের কথা, কথা বলার সময় কাউকে থামিয়ে দেননি।ভক্তেরা মন খুলে গুরুদেবের নিকট বলতেন, ভক্তের কথা শুনে তিনি ২/১ কথায় তার উত্তর দিতেন যা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।গুরুদেবকে কোনদিন রাগান্বিত দেখিনি বা রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলতেও শুনিনি।আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে গুরুদেবকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তিনি সাধারণ মানব ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার।মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যই তিনি মানবের রূপ ধারণ করেছেন।

চিকিৎসক যা পারেনি:

গুরুদেব দেহ রাখার পর বয়:জেষ্ঠ গুরুভাইগণ ধামে একদিন এক সভার আয়োজন করেন।উক্ত সভায় আমি শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।সভায় গুরুভাইগণ ধাম কিভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।সভায় উপস্থিত ছিলেন দুইজন মুসলিম ভক্ত (১) জনাব মতিউর রহমান (২) জনাব আলম।মতিউর রহমান কেন এবং কিভাবে ধামে আসা শুরু করেন তা বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন - আমি মতিউর রহমান একজন ঠিকাদার, কিছুদিন পূর্বে আমি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হই, আমাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, চিকিৎসা চলতে থাকে, কিন্তু যথাযথ উন্নতি না হওয়ায় মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়।বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেডিক্যাল বোর্ড এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং আমার পরিবারকে বলেন যে, আমি আর দুই মাসের অধিক বাঁচব না, আমি যা খেতে ইচ্ছুক তা যেন আমাকে খাওয়ানো হয়।মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত শুনে আমার পরিবার হতাশায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্তটি আমার পরিবার থেকে যদিও সরাসরি আমাকে বলেনি তবু আমি জেনে ফেলেছি, মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।কি করব ভাবতে লাগলাম।এই অবস্থায় আমার এক বন্ধু আমাকে বলেন - ডাক্তারের চিকিৎসাতো অনেক করিয়েছ, এবার অন্য একটা কাজ করে দেখতে পারো, তখন আমি জিজ্ঞেস করি সেটা আবার কি কাজ ? তারপর আমার বন্ধুটি আমাকে বলেন - ঢাকা মেডিক্যালের উত্তর পাশে শিববাড়িতে এক সাধু আছেন, লোকমুখে শুনেছি তিনি যাকে যা বলেন তা-ই ফলে, তুমি যদি ওখানে যাও গিয়ে দেখতে পারো, গিয়ে দেখনা সাধু কি বলেন ? আমার এই বন্ধুর কথা শুনে আমি একদিন এই ধামে আসি। এসে দেখি বাবা আসনে বসা, কয়েকজন লোক নীচে বসা, আমি ভয়ে ভয়ে এক কোনায় গিয়ে বসলাম, বাবা আমার দিকে একটু তাঁকালেন। এরপর দেখি যারা বসা ছিল তাদের মধ্য থেকে এক এক করে নিজেদের অভাব অভিযোগ বাবার নিকট বলছেন এবং কি করে পরিত্রান পাবেন তা জিজ্ঞেস করছেন।তাদের কথা শুনে বাবা কাউকে শান্তনা দিচ্ছেন আবার কাউকে পরিত্রাণের পথ বলে দিচ্ছেন।আমি আমার বিপদের কথা বলব ভাবছি, কিন্তু সাহস পাচ্ছিনা, কিছুক্ষণ বসে থেকে কিছু না বলেই চলে আসি।পরের দিন বন্ধুটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি গিয়েছি কি-না, আমি তখন বললাম গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাইনি।বন্ধুটি বলেন তুমি আবার যাও।কয়েকদিন পর আবার আসলাম, ঠিক আগের মত আসন ঘরের এক কোনায় চুপ করে বসে রইলাম।কিছুক্ষণ পর বাবা আমাকে বলেন - বাবা, আসা-যাওয়া রেখ সেড়ে যাবে, বাবার মুখ থেকে এ কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, ভাবলাম আমিতো তাঁকে কিছু বলিনি, তিনি কেমন করে আমার মনের কথা জানলেন ?

সত্যিইতো তিনি সাধারণ মানুষ নন।এরপর হতে আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল, আমি নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করলাম এবং আমার যে শারীরিক সমস্যা ছিল তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল, মেডিক্যাল বোর্ডের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হলোনা, আমি আজও বাবার কৃপায় বেঁচে আছি।তাই বলছি কেউ যদি এই ধামের ক্ষতি করার চিন্তা করে তাহলে এই মতিউর রহমানের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি ছাড়ব না।

জানতে চাইলে গুরু জানিয়ে দেন:

গুরুদেবের পাঁচালীতে বর্ণিত আছে – গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর লীলা সমাপ্ত করে পুরীতে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের সাথে লীন হয়ে যাওয়ার পূর্বে ভক্তেরা সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।ভক্তদের এই কান্না দেখে মহাপ্রভু তখন বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ভক্তদের প্রতিশ্রুতি দেন – তিনি আবার আসবেন কনৌজে রাধা-কৃষ্ণ এক দেহে ব্রজানন্দ রূপে।পাঁচালীর বর্ণনা অনুসারে যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তিনিই ব্রজানন্দ। এই বাক্যটি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হতো, গুরুদেব দেহ রেখেছেন বিধায় আমার মনের সন্দেহ কিভাবে দুর করি তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।এমন অবস্থায় আমি একদিন ভোর রাতে স্বপ্ন দেখছি – (আমার ঘরে গুরুদেবের একটি ছবি ছিল) গুরুদেবের ছবিটা যেখানে ছিল সেখানে রাধা-কৃষ্ণের যুগল ছবি, তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করি এখানে রাধা-কৃষ্ণের ছবি কি করে আসল ? পরক্ষনেই দেখি ওখানে গৌর-নিতাই'র ছবি, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাকিয়ে দেখি ঐ জায়গায় ঠাকুর ব্রজানন্দের ছবি আগের মতই আছে।আমার মনের সকল দ্বিধা-দন্ধ কেটে গেল, আমি নিশ্চিত হলাম ঠাকুর নিজেই আমার মনের দ্বিধা-দন্ধ দুর করেছেন।আমি আরও নিশ্চিত হলাম – কেউ যদি অন্তর দিয়ে ঠাকুরের কাছে কিছু জানতে চায় তাহলে ঠাকুর কোন না কোন ভাবে তাকে জানিয়ে দেন।প্রসংগত উল্লেখ্য – আমি এই স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পর গণপতি দেবের লেখা 'লীলা পরিচয়' বইখানি পড়ি।'লীলা পরিচয়' বইটিতে দেখতে পাই গণপতি দেব ঠিক এই রকম একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে একই জায়গায় প্রথমে ঠাকুর ব্রজানন্দকে এবং পরক্ষনেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মুর্তি দেখতে পেয়েছিলেন।গণপতি দেব এবং আমাকে গুরুদেব একইভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন – তিনিই ছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

গুরুদেবের বাণীর প্রমান কিভাবে পেলাম:

গুরুদেবের একটি বাণী আছে – "আমা হতে যা পাবে এই আসন হতেও তাই পাবে।জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।' এই বাণী যে, কতটুকু সত্য তা আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রমান পেয়েছি।ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করলে আসন থেকেও কাঙ্খিত বস্তু পাওয়া যায়।আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ২/১টি ঘটনা আপনাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বর্ণিত করার চেষ্টা করছি : - (১) সত্তোরের দশকে আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকুরি করতাম। চাকুরির বয়স এক বছরের কিছুটা বেশী হওয়ার পর কর্মচারিদের বেতন বৈষম্য দুরীকরণের জন্য কয়েকজন কর্মচারি আমাকে বলেন – আপনারতো মালিকের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে, আমাদের বেতন বৈষম্যের বিষয়টি একটু আলাপ করে দেখেন কিছু একটা করা যায় কি-না, তাদের কথা শুনে মালিকের সাথে আমি আলাপ করি, আলাপের প্রেক্ষিতে প্রথমদিকে মালিক কয়েকদিন পড়ে দেখার কথা বলেন এবং কয়েকদিন পর রাজি হলেন বৈষম্য দূরীকরণে, এরপর বিষয়টি নিয়ে মালিকের সাথে একদিন আমার ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং মালিক আমার উপর অসন্তুষ্ট হন।এক পর্যায়ে আমাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।চাকুরি চলে যাওয়ার পর কি করব তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি।কয়েকদিন বাড়িতে বসে থেকে ঠিক করলাম স্টেনোগ্রাফি শিখব, ঐ সময় স্টেনোগ্রাফির খুব ডিমান্ড ছিল, স্টেনোগ্রাফি জানা থাকলে চাকুরি পাওয়া সহজ ছিল।এরপর একদিন ধামে গেলাম, গুরুদেব তখন কলকাতা ছিলেন, যেয়ে আসনে প্রনাম করে বললাম – ঠাকুর, আমার এই অবস্থায় আমি যে কি করব তা ভেবে উঠতে পারছিনা, অবশেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্টেনোগ্রাফি শিখব।স্টেনোগ্রাফি শেখা খুবই কষ্টদায়ক, তবু এই অবস্থায় এটা ছাড়া যে আমার চাকুরি পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা, তুমি আমার প্রতি কৃপা করো যাতে এটা শিখতে পারি এবং চাকুরি পাই। ঠাকুরের নিকট এই প্রার্থনা করে সারাদিন ধামেই কাটাই এবং সন্ধ্যা আরতির পর বাড়ি আসি।পরেরদিন আমি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হলাম এবং একনিষ্ঠভাবে প্রাকটিস চালিয়ে গেলাম।এক বছরে আমার শেখা প্রায় সমাপ্ত এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসে আবেদন করা শুরু করলাম, পাশাপাশি ইন্টারভিউ দেয়াও শুরু করলাম।ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে তের মাস চৌদ্দ দিনের মাথায় আমি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করি।এই চাকুরি পাইতে কাউকে এক কাপ চা-ও খাওয়াতে হয়নি আমার।ঠাকুরের কৃপা ছাড়া আমার পক্ষে এই কঠিন কাজে সফল হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা।

(২) ১৯৭৯ সালে আমি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করি, ১৯৮২ সালে সামরিক শাসকের ক্ষমতা দখলের পর আমাকে মন্ত্রণালয় হতে উদ্বৃত্ত ঘোষনা করা হয় এবং রাঙ্গামাটি জেলার লঙ্গদু উপজেলায় আত্মীকরণ করা হয়।রাঙ্গামাটিতে তখন শান্তিবাহিনীর খুব উৎপাত ছিল।আমার এই আত্মীকরণ (বদলী) আদেশ বাতিল/পরিবর্তন করার জন্য যত ধরণের সোর্স ছিল প্রয়োগ করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা। আসলাম ধামে, আসনে প্রনাম করে ঠাকুরের নিকট এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য কান্না-কাটি করলাম ।এই অবস্থায় প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিছুই করতে পারিনা।এদিকে সংস্থাপন সচিব আমাদের সচিবকে ফোন করে জানালেন – নূতন কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য কেন আমাকে রিলিজ করা হচ্ছে না ? রাঙ্গামাটি হতে বার বার তাগাদা দেয়া হচ্ছে আমাকে রাঙ্গামাটিতে যোগদান করার জন্য।সংস্থাপন সচিবের ফোন পাওয়ার পর আমাদের সচিব মহোদয় প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করেন আমাকে রিলিজ করার জন্য, কিন্তু তারপরও আমার স্যার উপ-সচিব (প্রশাসন) আমাকে রিলিজ না করে কিভাবে রাখা যায় সেই পথ খুঁজতে থাকেন।আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আবার আসলাম ধামে, আসনে ঠাকুরকে প্রনাম করে চোখের জল ফেলে বললাম – ঠাকুর, তুমি চাকুরি দিলেই বা কেন ? আর কেনই বা এত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেললে ? রাঙ্গামাটিতো আমি চাকুরি করতে পারব না, ওখানে শান্তিবাহিনীর খুবই উৎপাত, তুমি এই বদলী আদেশ বাতিল করার পথ দেখিয়ে দাও।ঠাকুরের কি কৃপা এর পরদিন আমি যেই কর্মকর্তার সাথে কাজ করতাম উপ-সচিব (প্রশাসন) আমাকে বলেন – বাবু, আপনাকে রাখার মত একটা পথ পেয়েছি, একটা

আদেশ পেয়েছি যেখানে বলা আছে - মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্বৃত্ত কর্মচারিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উন্নয়ন খাতে শুন্যপদে আত্মীকরণ করা যাবে।এই আদেশ পেয়ে উপ-সচিব(প্রশাসন) মহোদয় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এক অফিসে শুন্যপদে আমাকে আত্মীকরণের উদ্দেশ্যে আমাকে বলেন - আপনার ব্যক্তিগত নথি নিয়ে আসুন, আমি সাথে সাথে প্রশাসন শাখা থেকে আমার ব্যক্তিগত নথি নিয়ে আসলাম, তিনি ডিকটেশন দিলেন এবং আমাকে নোট রেডি করে দিতে বলেন।আমি সাথে সাথে নোট রেডি করে দিলাম।স্যার নিজে স্বাক্ষর করে নিয়ে গেলেন উর্ধতন কর্তপক্ষের নিকট এবং হাতে হাতে স্বাক্ষর করিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের পিএস এর নিকট দিলেন মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য।মন্ত্রী মহোদয় পরের দিন অনুমোদন করে দিলেন।নথি নীচে আসার পর আদেশ তৈরী করা হলো এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে একটি কপি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো।আমার রাঙ্গামাটিতে বদলী রহিত হয়ে গেল।আদেশ হওয়ার পরের দিন আমি আমাদের মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আত্মীকৃত অফিসে গিয়ে যোগদান করলাম এবং এর পরের দিন ডেপুটেশন অর্ডার নিয়ে আবার মন্ত্রণালয়ে যোগদান করলাম।এক বছর পর মন্ত্রণালয়ে একটি পদ শুন্য হলো, আমি আবার এই শুন্য পদে আমাকে আত্মীকরণের জন্য উপ-সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করলাম।উপ-সচিব মহোদয় আমার অনুরোধ রক্ষা করে ঠিক পূর্বের মত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে আমাকে আবার মন্ত্রণালয়ে আত্মীকরণ করলেন।গুরুদেবের অশেষ কৃপা না হলে এই কঠিন কাজ কিছুতেই করা সম্ভব ছিলনা।

(৩) এই আসনে প্রার্থনা করে আমার জীবনে আমি আরও বেশ কয়েকটি কঠিন কাজে সফলতা পেয়েছি, গুরুদেব আমাকে একটু দেরীতে হলেও সফলতা দিয়েছেন।

বয়:জেষ্ঠ গুরুভাই মনোরঞ্জন দা'র সাথে আলাপ:

আমার বয়:জেষ্ঠ গুরুভাই মনোরঞ্জন দা'র সাথে দীর্ঘদিন গুরুদেব সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল আমার।কয়েক বছর আমি সপ্তাহে একদিন সকালে ধামে যেতাম, সাড়াদিন ধামে থেকে সন্ধ্যা আরতির পর বাড়ি আসতাম। মনোরঞ্জন দা-ও সকালে ধামে আসতেন, সাড়াদিন ধামে থেকে সন্ধ্যা আরতির পর বাসায় যেতেন, কিছুদিন তিনি সার্বক্ষনিক ধামেই ছিলেন।ঐ সময় তাঁর সাথে গুরুদেব সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু জানতে পেরেছি।জানতে পারি তিনি ৪০ (চল্লিশ) বছর গুরুদেবের সান্নিধ্যে ছিলেন, গুরুদেব কোথাও গেলে তাঁকে সাথে করে নিয়ে যেতেন।ফলে গুরুদেব বিভিন্ন সময় ভক্তদের সাথে যে সকল কথা বলতেন তা কাছে থেকে শ্রবন করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর।

মনোরঞ্জন দা'র সাথে আলোচনার মাধ্যমে একদিন জানতে পারলাম - গুরুদেব ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার এক গ্রামে এক শিষ্যের বাড়ি গেলেন দর্শন দিতে, সঙ্গী হিসাবে নিয়ে গেলেন মনোরঞ্জন দা এবং আরও দুইজনকে।গ্রামের বাড়ি - এক বাড়ির সাথে আরেক বাড়ির সংযুক্তিতে পাড়ায় পরিনত।দমদম গুরুধাম হতে যাওয়া হয়েছে, তাই দুপুরের আগেই ওখানে যাওয়া হয়।গুরুদেব যাওয়ার পর গুরুদেবকে ঘরের বারান্দায় আসন করে দেয়া হয় বসার জন্য, গুরুদেব আসন গ্রহণ করেন।এর মধ্যে পাড়ার সকলের মাঝেই জানা-জানি হয়ে যায় এবং ২/৪ জন করে আসতে থাকে গুরুদেবকে দেখার জন্য।কেহ এসে গুরুদেবকে প্রনাম করে চলে যায়, আবার কেহ গুরুদেবকে প্রনাম করে নিজের অভাব/অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করে।গুরুদেব সকলের কথাই শোনেন, কারোর কথা শুনে শান্তনা দেন, আবার কাউকে পরিত্রাণের পথ বলে দেন।এমন অবস্থায় পরিধানে শালু কাপড় এক তান্ত্রীক ক্ষিপ্তগতিতে গুরুদেবকে যাচাই করার জন্য এলেন, এসেই গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন - 'বলেনতো মা বড় না বাবা বড়?' গুরুদেব কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বলেন - বাবা, দু-পাল্লাই ভারী দু-পাল্লাই ভারী।গুরুদেবের কথা শুনে সেই তান্ত্রীক আর কোন কথা না বলে সাথে সাথে চলে গেলেন ঐ বাড়ি থেকে।

মনোরঞ্জন দা আরেকটি ঘটনার বর্ণনা করলেন ঐদিন।ঘটনাটি হলো - গুরুদেব তাকে সাথী করে পশ্চিম বঙ্গের অন্য এক গ্রামে গেলেন এক শিষ্যের বাড়িতে দর্শন দিতে।রাত্রিযাপন করবেন ঐ বাড়িতে।গুরুদেবকে ঘরের মধ্যে আসন করে দেয়া হলো বসার জন্য, গুরুদেব আসন গ্রহণ করলেন।আসে-পাশের লোকজন সকলের মধ্যে জানা-জানি হয়ে গেল গুরুদেবের আগমন বার্তা।প্রতিবেশীদের আগমন শুরু হলো, ঘর লোকে ভরে গেল।ঐ সময়টা ছিল বর্ষাকাল।তখন সন্ধ্যারাত্রি, গুরুদেব আশীর্বাদ নিতে আসা ভক্তদের প্রার্থনা শুনছেন এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী শান্তনা/বাক্যদান করছেন।এই অবস্থায় গুরুদেব মনোরঞ্জন দা-কে উদ্দেশ্য করে বলেন - মনোরঞ্জন, জুতাগুলো ঘরের ভিতর নিয়ে আস, বৃষ্টি আসলে ভিজে যাবে।গুরুর আদেশ শুনে মনোরঞ্জন দা বাহিরে আসলেন, বাহিরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন আকাশে মেঘ আছে কি-না, আকাশে তখন মেঘ ছিলনা, আকাশ ছিল তাঁরায় ভরা।আকাশে তাঁরা দেখে ঘরে গিয়ে মনোরঞ্জন দা গুরুদেবকে বলেন - আকাশে মেঘ নেইতো, আকাশ তাঁরায় ভরা। মনোরঞ্জন দা'র কথা শুনে গুরুদেব কিছু বললেন না, তবে মনোরঞ্জন দা সাথে সাথে বুঝতে পারলেন তার কথায় গুরুদেব খুশি হন নি।তিনি এটাও উপলব্দি করলেন যে, গুরুদেবের আদেশ মোতাবেক আকাশের দিকে না তাকিয়ে তার উচিৎ ছিল জুতাগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে নেয়া, তাহলেই গুরুর আদেশ পালন করা হতো।গুরুদেব হয়তো এটাই চেয়েছিলেন আমার নিকট হতে, কিন্তু আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছি।গুরু যা করতে বলেন, চক্ষু বন্ধ করে তা বাস্তবায়ন করাই শিষ্যের কর্তব্য।

বৃটিশ শাসনের সময় বর্ধমানের রাজা আসতেন গভর্নর হাউজে (বর্তমানে বঙ্গভবন) অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করতে রাষ্ট্রিয় কাজে। একমাস থাকতেন ঢাকায়, তাঁর অবস্থানের জন্য তৈরী করা হয়েছিল বর্ধমান হাউজ (বর্তমানে বাংলা একাডেমি), তিনি এই হাউজে অবস্থান করতেন সভা চলাকালীন সময় পর্যন্ত।একবার রাজা এসেছেন সম্মেলনে যোগদান করতে।ঐ সময় রাজার মেয়ের এক অসুখ দেখা দিল, যথারিতি চিকিৎসা করা হলো, কিন্তু বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা করা সত্বেও অসুখ ভাল হচ্ছেনা।এই অবস্থায় রাণীমা হাউজের কেয়ার টেকারকে পাঠালেন গুরুদেবের নিকট।রাণীমা কেয়ারটেকারকে বলে দিলেন - ওখানে এক সাধু আছে, তাঁকে গিয়ে বলো যে, রাণীমা পাঠিয়েছেন আপনাকে জিজ্ঞেস

করার জন্য - রাণীমার মেয়ে আজ সপ্তাহ খানেক চলছে অসুস্থ, চিকিৎসা করা সত্বেও মেয়ে ভাল হচ্ছেনা কেন ? রাণীমার বিশ্বাস - যেখানে সাধুর অবস্থান তার আসে-পাশে অমঙ্গল থাকতে পারেনা।আপনি প্রতিবেশী থাকা সত্বেও কেন রাণীমার মেয়ে এতদিন অসুস্থ থাকে ? কেয়াটেকারের কথা শুনে গুরুদেব বলেন - যাও তোমার রাণীমাকে গিয়ে বল, তার যদি এই বিশ্বাস থাকে যে - সাধুর অবস্থানের আসে-পাশে অমঙ্গল থাকতে পারেনা, তাহলে তার মেয়ে খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠবে।গুরুদেবের কথা শুনে কেয়ারটেকার রাণীকে যেয়ে বলে, কেয়ারটেকারের কথা শুনে রাণী খুশি হলেন।এরপর ধীরে ধীরে রাজার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলো।মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রাণী রাজাকে বিস্তারিত খুলে বলেন এবং একদিন ঝুরি ভরে বিভিন্ন ধরণের ফলসহ রাজা ও রাণী মেয়েকে নিয়ে ধামে আসেন গুরুদেবের নিকট।এসে রাণীমা গুরুদেবকে প্রনাম করে বলেন - বাবা, আপনার আশীর্বাদে আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে।রাজা তখন গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেন - আপনার কি প্রয়োজন আমাকে বলেন আমি ব্যবস্থা করে দিব।উত্তরে গুরুদেব বলেন - বাবা, আমি সন্যাসী, আমার কোন প্রয়োজন নেই।রাজা আর কোন কথা না বলে আসন ঘর হতে বাহিরে আসলেন চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।রাজা যখন গেইট পার হবেন তখন ধামবাসী একজন বলেন - রাজা মহাশয়, বৃষ্টি আসলে শিবের মাথায় জল পড়ে, টিনের চালা ভাঙ্গা, যদি টিনের চালার পরিবর্তে ইট দিয়ে শিবের ঘর করে দিতেন ভাল হতো, আর পূজার থালা-বাসন সামনের পুকুর থেকে মাঝতে হয়, কাঁদার মধ্যে মাঝতে খুবই অসুবিধা হয়, যদি ছোট করে ইট দিয়ে একটি ঘাটলা তৈরী করে দিতেন ভাল হতো, আর সামনের রাস্তাটি বৃষ্টি হলে কাঁদা হয়ে যায়, ভক্তদের আসা-যাওয়ায় খুবই অসুবিধা হয়, যদি কিছু ইট বিছিয়ে দিতেন ভাল হতো।রাজা তখন বলেন - আচ্ছা আমি দেখছি, এ কথা বলে রাজা চলে গেলেন।পরের দিন রাজা মহাশয় এক ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দেন শিব মন্দির, রাস্তা এবং পুকুরে একটি পাকা ঘাটলা তৈরী করার এষ্টিমেট দেয়ার জন্য।এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিব মন্দির (মঠ বিহীন), সামনের রাস্তা এবং পুকুরে একটি পাকা ঘাটলা করে দিলেন বর্ধমানের রাজা মহাশয়।

একদিন গুরুদেবের বুড়াশিব ধামে আগমন সম্পর্কে তিনি কতটুকু জানেন তা জানতে চাই।আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন - তিনি জানতে পেরেছেন, বাবা ব্রজানন্দ ভারতের উত্তর প্রদেশের কনৌজে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্ম নেয়ার অল্প কিছুদিন পরই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়।তাঁর পিতা ছিলেন স্বামী ত্রিপুরানন্দ সরস্বতী, তিনি ছিলেন শিবের উপাসক।স্বামী ত্রিপুরানন্দের একমাত্র সন্তান ব্রজানন্দ।সহধর্মীনি বিয়োগের পর একদিন স্বামী ত্রিপুরানন্দ স্বপ্নে আদিষ্ট হন।তাঁকে বলা হয় - তোমার ঘরে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে সে সাধারণ মানব নয়, তাঁকে নিয়ে তুমি তীর্থে গমন করো এবং ঢাকা বুড়াশিব এর ওখানে চলে যাও, ওখান থেকে তাঁর লীলা প্রকাশ পাবে জগৎবাসীর জন্য। স্বামী ত্রিপুরানন্দ স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে শিশু ব্রজানন্দকে কাঁধে করে বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমন করে অবশেষে ঢাকা এসে রমনায় এক বট বৃক্ষের নীচে বুড়াশিবের সন্ধান লাভ করেন এবং পুত্র ব্রজানন্দকে নিয়ে বসে পরেন বুড়াশিবের পাশে।তৎকালে এই এলাকায় কোন মানুষের আবাস ছিলনা, চারদিকে শুধু জঙ্গল, আহার করতেন গাছের ফল। স্বামী ত্রিপুরানন্দ শিবের পূজা করতেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ব্রজানন্দ কোনদিন শিবের পূজা করেন নি। একদিন স্বামী ত্রিপুরানন্দ দেখেন - শিবের গলায় যে ফুলের মালা পড়িয়েছিলেন পূজা করার সময়, সেই মালা শিশুপুত্র ব্রজানন্দের গলায়।এই অবস্থা দেখে স্বামী ত্রিপুরানন্দ পুত্র ব্রজানন্দকে বলেন - তুমি কেন শিবের মালা নিজের গলায় পড়েছ ? তখন ব্রজানন্দ উত্তর করেন - আমিতো মালা পড়িনি, কে যেন পড়িয়ে দিল।পর পর কয়েকদিন এই ধরণের ঘটনা দেখতে পেলেন স্বামী ত্রিপুরানন্দ এবং রাগান্বিত হয়ে একদিন পুত্র ব্রজানন্দকে একটি গাছের সাথে বেঁধে স্বামী ত্রিপুরানন্দ শিবের পূজা দিতে বসলেন এবং পূজা দিলেন।পূজা শেষে পুত্রকে বাঁধন থেকে মুক্ত করার জন্য এসে দেখেন ব্রজানন্দ বাঁধন অবস্থায় আছে, কিন্তু তাঁর গলায় বুড়াশিবকে পূজার সময় দেয়া মালা, তখন স্বামী ত্রিপুরানন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারলেন তাঁর পুত্র রূপে জন্ম নেয়া ব্রজানন্দ সত্যিকারেই সাধারণ মানব নন।

এইভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন।ব্রজানন্দ সাবালক হওয়ার পূর্বেই স্বামী ত্রিপুরানন্দ দেহ ত্যাগ করেন।পিতার মরদেহ নিয়ে ভাবছেন ব্রজানন্দ কিভাবে সমাহীত করা যায় এই মরদেহ।এই অবস্থায় কয়েকজন সাধু এলেন কোদাল টুকড়ি নিয়ে এবং স্বামী ত্রিপুরানন্দের মরদেহ সমাহীত করা হয়।স্বামী ত্রিপুরানন্দের মরদেহ সমাহীতের পর সাধুগণ ব্রজানন্দকে নিয়ে যান স্বামীবাগে স্বামীজির আশ্রমে।পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন ব্রজানন্দ সারাদিন বুড়াশিব ধামে থাকতেন এবং রাতে চলে যেতেন স্বামীবাগে স্বামীজির আশ্রমে, পরেরদিন আবার আসতেন বুড়াশিব ধামে। এইভাবে চলে কিছুদিন, মানুষ ক্রমে ক্রমে বুড়াশিব এবং ব্রজানন্দের সন্ধান পেতে থাকে এবং ২/৪ জন করে আসা-যাওয়া শুরু করে। প্রথমদিকে ধামে রান্না হতোনা, ভক্তরা ফল-ফলাদি নিয়ে আসতেন, ঐ গুলো সেবা করেই গুরুদেব থাকতেন। পরবর্তীতে কোন কোন ভক্ত দুধ আনা শুরু করলে সেই দুধ গরম করার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর ব্যাবস্থা করা হয়।সেই ব্যাবস্থা থেকেই ক্রমান্বয়ে রান্না করা আরম্ভ হয়।এরপর ধীরে ধীরে ভক্ত-শিষ্য বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে এই অবস্থায় এসে পৌছেছে।

ভগবান ব্রজানন্দ এর বাণী :

০১। একমাত্র ব্রজানন্দই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।এই জগতে যা কিছু সবই ‘‘ব্রজানন্দ’’।
০২। সর্বধর্ম বিসর্জন করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমার সর্বপাপ দূর করিব।
০৩। আমার শরণ যে নিয়েছে, আমার ভরসা যে করেছে, তার আর বিনাশ নাই।
০৪। নির্বান মুক্তিই একমাত্র কাম্য।মনুষ্য জন্মলাভও সেই জন্যই।এই জন্যইতো মনুষ্য জন্ম দুর্লভ।
০৫। আমার ভক্তের বিনাশ নাই – পরাজয়ও নাই।
০৬। ব্রজানন্দ নাম নেওয়া বাগান বন্যায় ভাসাইয়া লইতে পারবে না-না-না।
০৭। আমিত্বটাকে তুমিত্বে ডুবাইয়া দাও।
০৮। আমিটাকে তুলিয়া ফেল, এই আমিই সমস্ত অশান্তির মূল।

০৯। গুরু সর্বেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও নির্বাহ কর্তা।
১০। গুরু শরণাগত শিষ্যকে গুরুই সহায় হয়ে রক্ষা করেন।
১১। গুরুবাক্য সাক্ষাৎ ভগবৎবাক্য বলিয়া জানিও।
১২। গুরু সহায় না হইলে জীবের একটি তৃণও তুলিবার ক্ষমতা নাই।
১৩। গুরু ভক্তিতে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি নষ্ট হয়।
১৪। জীবের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, গুরুর ইচ্ছায় সবই হয়।
১৫। সদগুরু লাভ না হইলে সংসার সাগর পার হওয়া যায় না।
১৬। গুরুদত্ত নাম ও গুরু এক করিয়া জানিবে।
১৭। গুরু শিষ্য একই বস্তু, মায়াতে দুই দেখায়।সেই মায়া অপসারিত হয় জপ করিতে করিতে।
১৮। পোষ্য পালনে স্বর্গলাভ, পোষ্য পীড়নে নরক প্রাপ্তি ঘটে।
১৯। ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নাই।
২০। জীব মাত্রকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের উপকার করাই স্বাভাবিক ধর্ম জ্ঞানী পুরুষের।
২১। যে হৃদয়ে ক্ষমা নাই, দয়া নাই, সে হৃদয়ে ভতক্তি ও জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না।
২২। অহিংসা, জীবে দয়া – এইসব কর্মই অন্ধকার হইতে আলোর পথে লইয়া যায়।
২৩। পিতাকে ভক্তি করিলে স্বর্গলাভ, মাতাকে ভক্তি করিলে সংসার সুখলাভ হয়, স্ত্রীকে ভালবাসলে লক্ষী সুপ্রসন্ন হন।আর গুরুকে ভালবাসিলে, ভক্তি করিলে এই কয়টাতো হয় - উপরন্তু কৈবল্য লাভ হয়।

২৪। সুখ যোগে, সুখ গুরু পাদপদ্মে – সেই সুখ কোন কালে ফুরোয় না।সংসার সুখে কেবলি দু:খ আর জ্বালা, কেবল ঘুরাঘুরি, আসা-যাওয়া, মুক্তি নাই।

২৫। আচার বিচার কেবল মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র।আচার বিচার মানিয়া চলার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ।

২৬। তুমি যদি হাজার বছর গঙ্গাস্নান করো বা নিরামিষ খাও তাতে যদি তোমার আত্মবোধ না জন্মে, গুরু চিনতে না পারো, তবে তোমার আচার বিচার সবই মিথ্যা।আর আচার বর্জিত হইয়া কেহ যদি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তবে জানিবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার।শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করার উদ্দেশ্য বিষয়ে বৈরাগ্য আনার জন্য।

২৭। আজকাল লোকেরা সংযম নিয়ম পালন করে বটে, কিন্তু সেইসব নিয়ম-নিষ্ঠা কিসের জন্য করিতে হয়, তাহা জানে না।লৌকিক গুরুরাও সেইসব শিক্ষা দেয় না।

২৮। যার যেমন কর্ম তার তেমন ফল।